সর্ষেমঙ্গল

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি পাটনায় একটা কলেজে সবে ঢুকেছি লেকচারারের কাজ পেয়ে। মাইনেপত্তর সামান্য। তবে ব্যাচেলার মানুষ, তাতেই চলে যায় মোটামুটি। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি। আজমপুর থেকে বন্ধু সদাশিব আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভাবলাম গরমের ছুটির খানিকটা তার কাছেই কাটিয়ে আসি। অবশ্য আজমপুরে গিয়েও প্রচণ্ড গরম ও কালান্তক লু'এর হাত থেকে নিস্তার পাবো না। তবে স্থান পরিবর্তন হ'বে। হাল্‌কা পকেটে শিমলা-দার্জিলিঙের আকাশকুসুম রচনা করে আর লাভ কি !

আজমপুর জায়গাটা না শহর না গ্রাম। সদাশিবের বাবা প্রচুর জমিজায়গা রেখে গেছেন। শেষজীবনে একটা কোল্ড স্টোরেজও খুলেছিলেন ভদ্রলোক। সদাশিবরা তিন ভাই। ও সবার বড়। তিন ভাই মিলে জমিজিরেত ব্যবসাপত্তর দেখাশোনা করে। মোটা আয়। সচ্ছল স্বাধীন জীবন। দোষের মধ্যে এম.এ. পাশ করেছে সদাশিব, চাষাভুষোর ভিড়ে কোল্ড স্টোরেজে আলুর বস্তা নিয়ে জীবন কাটাতে মাঝে মাঝে ঘোর আপত্তি জানায় তার উচ্চ-শিক্ষিত শহরঘেঁষা মন।

আজমপুরে ডিগ্রীধারী যে ক'জন, তাদের অধিকাংশই চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। বাকি যারা ডেলিপ্যাসেন্জারি করে তাদের দর্শন মেলা ভার। সারা হপ্তা ট্রেনের ঝাঁকানি খেয়ে ছুটিছাটায় আড্ডা দেবার এনার্জি থাকে না। চারপাইয়ে পড়ে গায়েগতরের ব্যথা মারতেই ছুটি কাবার হয়ে যায় তাদের। বেচারা সদাশিব প্রবুদ্ধ সাহচর্যের অভাবে ভারী শীর্ণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছে মনে মনে। এ কথা চিঠির মারফৎ বহুবার জানিয়েছে সে এবং নির্বন্ধ অনুরোধ করেছে যে ছুটিতে অন্তত কিছুদিন তার কাছে কাটিয়ে যাই যেন।

আমার কিন্তু জায়গাটা খুব ভাল লাগলো। বিরাট বাড়ি ওদের। একটু সেকেলে ধরনের হলেও বেশ খোলামেলা। একপাল চাকর বাকর হুকুম তামিলের জন্য মোতায়েন রয়েছে। খাওয়াদাওয়া সে এক এলাহি পর্ব : দই, দুধ, ঘি, মাখন, পুরি, মালপুয়া, খাজা, লাড্ডুর ছড়াছড়ি। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে আমি। আতিথ্যের ঘটায় যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম, নিজেকে ছোটখাটো রাজাগজা বলে ভ্রম হতে লাগলো মাঝে মাঝে।

একদিন বিকেলের দিকে সদাশিব বললো, "চল তোকে গোয়ালাবাবার কাছে নিয়ে যাই। সাধক পুরুষ। ভাল লাগবে তোর।"

আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরে মনিব্যাগটা চেপে ধরে বললাম, "না ভাই, আমি ওসব জায়গায় যেতে চাই না।"

সদাশিব হেসে ফেলে বললো, "আরে তুই যা ভাবছিস্ তা নয়, গোয়ালাবাবা একেবারে অন্য ধাতের মানুষ। একটা পয়সা নেন না কারো কাছে।"

বললাম, "তার মানে দিল্লীর সেই এলাইচিবাবার মতন ! তা হরে দরে একই দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত। কাজ নেই ভাই ওসবের মধ্যে গিয়ে।"

"এলাইচিবাবা? সেটা আবার কি চীজ?"

বললাম, "সে একটা চীজ বটে, সাংঘাতিক চীজ।" সদাশিবকে খুলে বললাম আগাগোড়া, সেই এলাইচিবাবার উপাখ্যান।

আমি তখন কলেজে পড়ি। মাসতুতো বোনের বিয়েতে দিল্লী গেছি। বিয়ে চুকে গেছে।

মাসিমা বললেন, "অদ্দুর থেকে এসেছিস্ যখন আর ক'টা দিন থেকে যা।"

মাসতুতো ভাই তপনকে গাইড করে সারা লঙ্কা চষে বেড়াচ্ছি। একটা বড় বাড়ির সামনে বিরাট ছবি ঝুলছে দাড়িওয়ালা একটা লোকের। নেতা ফেতা নয়তো? এমন ফলন্ত দাড়িগোঁফওলা কাউকে মনে পড়ে না তো ! কাছে এসে ছবির তলায় বিজ্ঞপ্তি পড়ে মালুম হ'ল ইনি এলাইচিবাবা, এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ। আধি-ব্যাধি, মামলা-মোকদ্দমা, নজরলাগা-চোখওঠা, বিবাহ-পরকীয়া, পুত্রলাভ-

শত্রুনিপাত, তাবৎ সমস্যার সমাধান করে দেন এক ফুৎকারে এবং একেবারে বিনিপয়সায়। বিশ্বময় ঘুরে ঘুরে লোকের দুঃখ ভঞ্জন করে বেড়ান। আপাতত দিল্লীবাসীর দুঃখমোচন-কল্পে এখানে শিবির গেড়েছেন। শীগ্‌গীর আবার দূর বিদেশে পাড়ি দেবেন সেখানকার আর্ত মানবের ডাকে সাড়া দিতে।

তপন বললো, "কি বিরুদা, গিয়ে দেখবে নাকি?"

তখনো জীবনে তেমন কোন ব্যক্তিগত সমস্যা খাড়া হয়নি তবে কৌতুহল ছিল অপরিসীম।

বললাম, "ক্ষতি কি, পয়সা তো আর লাগবে না!"

হায়রে, তখন কি আর জানতাম? পাটনা ফেরার টিকিট বাবদ আশী টাকা পকেটে ছিল। সেই টাকা কটা গচ্চা দিয়ে তবেই সে যাত্রা এলাইচিবাবার আখড়া থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।

সদাশিব চোখ কপালে তুলে বলে, "তবে যে বললি পয়সাকড়ি কিছুই নেন না বাবা?"

"বাবারও যে বাবা থাকে। উনি নিজে না নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গোদের মারফৎ নেন। বুঝলি সদাশিব, আটঘাট সব বাঁধা। সেই বাড়িটা আসলে একটা সস্তা হোটেল। উপরে দু'খানা ঘর নিয়ে বাবা বিরাজ করছেন তাঁর চেলাচামুণ্ডা সমেত। প্রথম ঘরটা রিসেপশন। ঘরে ঢুকতেই ষণ্ডামার্কা দু'জন লোক আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিলো ভাল করে। তারপর দু'খানা ফর্ম ধরিয়ে দিলো আমাদের হাতে ----- আমাদের পেশা, অভিপ্রায়, নামধাম যাবতীয় তথ্য ভরতে হবে তাতে।

"আরও কয়েকজন লোক ঝিম্ মেরে বসে আছে ঘরে। একটি বৃদ্ধা বসে বিড় বিড় করে মন্তর জপছে, তার পাশে বুড়ো মতন একটা লোক চোখ বুঁজে চেয়ারে মাথা এলিয়ে থেকে থেকে আওয়াজ করছে, 'হায় রাম, হায় রাম'। ঘরের অন্যদিকে এক মধ্যবয়সী মহিলা বিরস মুখে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে রয়েছেন। তারও একটু দূরে লম্বাচুলওলা মস্তান চেহারার দুটো ছোঁড়া এক কোনে বসে উসখুস করছে, চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা ভাব। মনে হ'ল উটকো কোন বেকায়দায় ফেঁসে গেছে

বাছাধনেরা।

"তপন আর আমি ফর্ম দুটো ভরতেই ষণ্ডাদু'টোর একজন আমাদের হাত থেকে সেগুলো নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এলো একটা পিতলের রেকাবী নিয়ে। রেকাবীতে কয়েকগাছা লাল রঙের সুতো ও খানিকটা সিঁদুর। লোকটা হড়ংবড়ং করে কিসব মন্তর বলতে বলতে আমাদের কপালে সিঁদুরের লম্বা তিলক টেনে দিলো একেবারে নাক বরাবর। তারপর হাতের কব্জিতে এক গাছা করে লালসুতো বেঁধে দিয়ে আমাদের দুজনের হাতে একটা করে ক্ষুদে মোড়ক ধরিয়ে দিলো। পুরীতে যেমন কাপড়ের ছোট ছোট পুলিন্দায় প্রসাদ বিলি হয় অনেকটা সেইধরনের। তবে এগুলো ব্যাণ্ডেজের কাপড়ের মত কোরা জ্যালজেলে কাপড় দিয়ে বানানো। পুলিন্দার মধ্যে দশপনেরোটা করে এলাচ।

"আমাদের হাতে সে দু'টো গুঁজে দিয়ে ষণ্ডামার্কা জলদ গম্ভীর গলায় বললো, 'হাঁজী, অস্‌সি রুপয়ে নিকালো"।

আমরা দু'জন পিলে চম্‌কানি কাটিয়ে কিছু বলতে যাবো তার আগেই দু'নম্বর ষণ্ডামার্কা আমার কাঁধে হাতের থাবা রেখে অদ্ভুতদৃষ্টিতে আমার চোখের পানে চাইলো। দেখলাম তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, গোঁফজোড়া ভীতিজনকভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পকেটে হাত গলিয়ে মনিব্যাগ বার করলাম। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে সেটি উজাড় করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম এলাচের পুঁটলি দু'টো মুঠোয় ধরে।"

"আর এলাইচিবাবা?"

"না ভাই, সে যাত্রা আর তাঁর দর্শনলাভ হ'ল না। সাহসে কুলোলো না আমাদের।"

এলাইচিবাবার কাহিনী শুনে সদাশিব হাসতে থাকে।

তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বলে, "এবার বুঝলাম সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি তুই এত বিরূপ কেন। ভয় নেই, গোয়ালাবাবা সাধুটাধু কিছুই নন। একটু আলাদা টাইপের মানুষ এই যা। রীতিমত লেখাপড়া জানা মার্জিত লোক। পয়সাকড়িও আছে নিজের। মাত্র বছর খানেক হল কুলহরিয়া গ্রামে এসে উঠেছেন। এই এক বছরে চেহারা

ফিরে গেছে গ্রামের। সব কিছুর মধ্যেই আছেন তিনি। সকালে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখান, রাতে বড়দের।

"দু'টো গোরু আছে। নিজেই তাদের সেবাযত্ন করেন, যার দরুন এ তল্লাটে এই খেতাব অর্জন করেছেন। গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে বালতিতে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামের দুস্থ পরিবারের শিশুদের এবং রুগ্ন মানুষদের গেলাস ভরে দুধ খাইয়ে আসেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে কূয়ো খুঁড়িয়েছেন গাঁয়ের লোকদের দিয়ে, নিজেও তাদের সঙ্গে মাটি কুপিয়েছেন। ছোটখাটো অসুখবিসুখে ওষুধ দেন, বড় কিছু হ'লে বাড়ির লোকদের বকে বুঝিয়ে রুগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নইলে জানিস তো এখানকার মানুষগুলোকে ! ধারধোর করে মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক করাবে কিন্তু চিকিৎসা করাবে না। দূর এলাকা থেকেও আসে কেউ কেউ। নানান সদুপদেশ দেন তাদের। আমার ভাই ভারী ভাল লাগে মানুষটাকে।"

অবশেষে সদাশিবের আগ্রহে কুলহরিয়া অভিমুখে রওনা হ'লাম একদিন। আজমপুর থেকে বেশী দূর নয়। আমরা যখন গোয়ালাবাবার আস্তানায় পৌঁছলাম বিকেল হয়ে গেছে। একটা আটচালার সামনে গোটা তিনেক চারপাই বেছানো রয়েছে। তার উপর বসে নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলছে জনতিনেক লোক। বেশবাসে সম্পন্ন গৃহস্থ বলে মনে হয়। আর একটা চারপাইয়ে একটা ছোট ছেলে টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছে। পাজামা ও গেন্জি পরা ঢ্যাঙামত একটা লোক ঝুঁকে পড়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে ছেলেটাকে।

সদাশিব লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানিয়ে আমার পরিচয় দিলো। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম এই লোকটাই সেই গোয়ালাবাবা। বাবা হাসিমুখে প্রতিনমস্কার জানিয়ে পাশের চারপাইয়ে বসতে বললেন। তারপর ছেলেটিকে সযত্নে তুলে বসালেন। একটু তফাতে দুঃস্থ চাষাভূষো গোছের একটা লোক দাঁড়িয়েছিল নম্র নতমুখে। বোঝা গেল ছেলেটির জনক। গোয়ালাবাবা তাকে নানান উপদেশ নির্দেশ দিলেন। তারপর তারা চলে গেলে আমাদের কাছে এসে বসলেন চারপাইয়ে পা ঝুলিয়ে।

সদাশিব বললো, "ছেলেটার অসুখ করেছে বুঝি?"

উনি বিষন্ন মুখে অল্প হাসলেন।

বললেন, ""করেছে, আবার করেও নি। রোগ বলতে কিছু নেই তবে দারিদ্র ও অজ্ঞানতার দুই দানব যেখানে বিদ্যমান সেখানে আর মরার জন্য রোগে পড়তে লাগেনা মানুষের ----।"

কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি, "ভাবতে পারো গ্রামে যেখানে এতসব কুল, পেয়ারা, কাঁচা আম ফলে থাকে চারিদিকে, গ্রামের বাচ্চাগুলো ভিটামিনের অভাবে রোগের ডিপো হয়ে বসে আছে এক এক জন ! দামী পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য এদের নেই, অথচ একগাদা ভুল ধারণা, যুক্তিহীন সংস্কার আর অহেতুক সাবধানতার দরুন এরা সুলভ খাবারগুলোও ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে না।"

আমার পাশের সজ্জনটি মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বললেন, "বাবা তাই একধার থেকে ফলের গাছ লাগিয়ে চলেছেন গাঁয়ে ---- কাগজীলেবু, পেঁপে,আমলকী, আম, আরও কত কি ! আবার ওদিকে অন্তত বিশ তিরিশটা সজনেগাছ। বাবার কথামত গ্রামের মায়েরা এখন নিয়মিত সজনে পাতা রেঁধে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে যাতে তাদের চোখ ভাল থাকে, অকালে দৃষ্টিশক্তি হারাতে না হয়।"

বললাম, "গাছেদের দেখাশোনা করে কে?"

"কাজ সব ভাগ করে দেওয়া আছে। বাবা মাঝে মাঝে ঘুরে দেখে আসেন সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা। দরকার পড়লে নিজেই হাত লাগান।"

আমার মনের মাঝে তীব্র কৌতুহল ও বিস্ময় দোলা দিচ্ছে তখন। কে এই লোকটি? বেশভূষা, কথাবার্তা, চালচলনে তথাকথিত 'বাবা'দের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। উনি বোধহয় আমার মনের কথা টের পেলেন।

আমার দিকে চেয়ে সস্মিত মুখে বললেন, "দেখুন, আমার নাম কিন্তু যমুনা প্রসাদ। আপনি আমাকে বিনা দ্বিধায় যমুনাবাবু বলে ডাকতে পারেন। 'গোয়ালাবাবা' খেতাবটি সম্প্রতি অর্জন করেছি আমার গোরুদু'টির কল্যাণে।"

খানিক বাদে নৈশ পাঠশালার ছাত্ররা একটি দু'টি করে এসে জড় হতে লাগলো। সবসুদ্ধু জন আষ্টেক লোক। অধিকাংশই যুবক। দু'জন পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ও আছে। ছাত্রসংখ্যা রোজদিন সমান থাকেনা। মাঝে মাঝে কাজে আটকে পড়ে গরহাজির হয় কেউ কেউ। আটচালার সামনে নিকোনো আঙ্গিনায় অর্ধ-চক্রাকারে বসলো ওরা। আমরা অভ্যাগতরা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উঠে পড়লাম।

যমুনাপ্রসাদ (আমার এই নামটাই পছন্দ) আমার মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন তার উত্তর খুঁজতেই বুঝি বার বার গেছি সেই কুলহরিয়া গ্রামে। আরও অনেকে আসতেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে। কেউ কেউ আলোচনায় যোগ দিতেন, কেউ বা কেবল অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকতেন তাঁর মুখের পানে। কথা বলতে বলতে তীব্র এক সজীবতা ফুটে উঠতো যমুনাপ্রসাদের চোখেমুখে। মনে হত কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে নয়, তাঁর সমস্ত সত্তাকে তরঙ্গিত করে উঠে আসছে অন্তঃস্থলের গভীর হ'তে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল অনেক। নানা বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করতাম আর উনি নিজের দৃষ্টিকোণ আমাদের সামনে মেলে ধরতেন। দেখলাম সব বিষয়ে ----- রাজনীতি, সমাজসেবা, ধর্ম-কর্ম ----- তাঁর সার বক্তব্য একটাই।

যমুনা প্রসাদ বলতেন, "তোমার চারদিকে চেয়ে দেখ কত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে সবাই। যতখানি পারো তাদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করো। দাঁড়িয়ে ভেবোনা, বিচার বিবেচনা কোরোনা। কাজ অনেক, সময় অল্প। সামনে ডুবন্ত মানুষ দেখলে কি কেউ তার নাম-ধাম জানতে চায়, নাকি বার-বেলা বিচার করে? জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষটাকে ডাঙ্গায় টেনে তোলাটাই প্রধান এবং একমাত্র করণীয় তখন। তেমনি সংসার সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে হাঁকু-পাঁকু করছে তোমার চারিদিকে কতশত প্রাণী। তুমি হয়তো ভাবছো তোমার আর কতটুকুই বা ক্ষমতা, কীই বা করতে পারো তুমি। তোমার এ ধারণা ভুল। আর কিছু না থাক হাত-পা, চোখ-মুখ তো আছে? তুমি কোন ক্লান্ত দুর্বল পথিককে হাত ধরে তার চলার পথে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারো। দুঃখী আশাহত মানুষকে দু'টো ভাল কথা বলে তার মনে একটু শান্তি একটু আনন্দ একটুখানি আত্মবিশ্বাস এনে দিতে পারো ----।"

বললাম, "ভগবান সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।"

যমুনাপ্রসাদ কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, "আশা করি নিরাশ হবে না।"

তারপর গম্ভীর মুখে বলেন, "ভগবান আছে কিনা সে তর্ক নিরর্থক। তবে ভগবান আছে একথা ভেবে যদি মানুষের সত্যিই উপকার হয় তবে তা ভাবতে বাধা কিসের?"

বললাম, "কিন্তু উপকার হয় কি?"

বললেন, "কখনো কখনো হয় বৈকি ! যেমন ধরো দুর্যোগের রাতে লোকালয়ের একপ্রান্তে রুগ্ন শিশুকে নিয়ে অতন্দ্র রজনী কাটাচ্ছে তার মা। বাপ কার্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে, নিকটতম প্রতিবেশীর কুটির পর্যন্ত মা'র চিৎকার পৌঁছবে না এই ঝড়-জল-বজ্রের গর্জন ছাপিয়ে। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনো অসম্ভব, তাকে একা রেখে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। মা নিরুপায় হয়ে ভগবানকে ডাকে এবং মনে জোর পায় তা থেকে। রাত পোহালে পাড়াপ্রতিবেশীর সাহায্যে মা হয়তো শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং সে হয়তো ভাল হয়ে ওঠে। আমরা সে কথা জানিনা। শুধু এটুকু জানি যে সেই দুর্যোগের রাতে ভগবানের উপর বিশ্বাসের জোরেই দাঁড়িয়েছিল বাচ্চাটির মা। ভেঙ্গে পড়েনি, বুদ্ধি হারায়নি। একি কম উপকার?

"আবার আর একটা উদাহরণ নাও। বাড়িতে কারুর খুব অসুখ। হয়তো টাইফয়েড, হয়তো নিউমোনিয়া, কিংবা অন্য কিছু। ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন, খুব একটা সাধ্যাতীত ব্যাপারও নয় সেটা। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তা না করে পুজোআচ্চা - মাদুলিমানৎ করতে লাগলো। ঠাকুরের ফুল - বিভূতি এনে দিলো রুগীকে। রোগ বাড়তে বাড়তে মানুষটা মরেই গেল শেষ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে ভগবানে বিশ্বাস করে উপকার নয়, অপকারই হ'ল বলতে হবে। আমার কি ধারণা বলবো? আবার একটা উদাহরণ দিতে হয় তবে। মনে করো দুর্জয় রক্তোন্মাদ শত্রুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলের পথে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছে তিনজন মানুষ। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তারা থমকে দেখলো সামনে বিপদসঙ্কুল গিরিসঙ্কট। একটা জরাজীর্ণ নড়বড়ে কাঠের পুল ছাড়া এগিয়ে যাবার আর কোনও পথ নেই। এদিকে পিছনে শত্রুদলের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে,

দ্রুত নিকটতর হচ্ছে সেই রক্ত হিমকরা অট্টরোল।

"ওই তিনটে লোকের মধ্যে যার ভগবানে অটুট বিশ্বাস সে তাঁর নাম নিয়ে ওই ভাঙ্গাপুল ধরেই এগিয়ে যাবে। সে স্থির নিশ্চিত যে ভগবান তাকে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় জন ভগবানে বিশ্বাসী হলেও ঠিক অতটা বিশ্বাসী নয়। সেও তাঁর নাম নিয়ে এগুবে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। তৃতীয় জন একেবারে ঘোর নাস্তিক। সে ভাববে, পুলটা যদি ভেঙে পড়ে তবে মরবো। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো মরতেই হবে শত্রুর হাতে। অন্য পথ যখন নেই তখন দেখাই যাক ওপারে পৌঁছতে পারি কিনা। এই বলে অতি সন্তর্পণে এগোনোর চেষ্টা করবে লোকটি।

"এরা শেষ অবধি নির্বিঘ্নে ওপারে পৌঁছতে পারবে কিনা, কিংবা এদের মধ্যে কেউ মাঝপথে পা হড়কে পড়ে প্রাণ হারাবে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। ভগবানে বিশ্বাসের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে হয়তো এমনও হতে পারে যে কেবলমাত্র প্রথমোক্ত লোকটাই পা হড়কে পড়ে মরলো অথচ বাকী দুজন দিব্যি বেঁচেবর্তে পৌঁছে গেল পুলের ওপারে। তবে কি প্রথম লোকটার ভগবানে বিশ্বাস ব্যর্থ হল? আমি তা মনে করি না। লোকটা পা হড়কে পড়ার পূর্বমুহূর্ত অবধি জেনে গেল যে তার পা হড়কাবে না, হড়কাতে পারে না। সেই জানা, সেই স্বস্তিটুকুই লাভ তার।"

বললাম, "আপনি তাহলে চান যে প্রত্যেকে ভগবানে বিশ্বাস করুক, তাঁকে ডাকুক?"

"না, আমি সেকথা বলিনা। সকলের কল্যাণ হোক, দুঃখকষ্ট উপশম হোক সেটাই বড় কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাসের দরুন যদি একটা লোক তার অকল্যাণকারী, অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলো দমন করে তা নিশ্চয় সুখের কথা। কিন্তু আবার ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য যখন লোকে নিরীহ জীবজন্তুকে বলি দেয়, তাঁর নামে গুচ্ছের যুক্তিহীন কুপ্রথা মেনে নিয়ে সামাজিক নির্যাতন করে তখন সেটাই অন্যায় অসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়।"

ভদ্রলোককে আমার বিরাট একটা প্রহেলিকা বলে মনে হ'ত। বিহারের গণ্ডগ্রামে এক আটচালার সামনে চারপাইয়ে বসে এসব কথা শুনে ভারি অবাক লাগতো আমার। যমুনাপ্রসাদকে একেবারে বেমানান

লাগতো উক্ত পরিবেশে। এখানে বলে রাখি যমুনাবাবু নামে কিন্তু আর কেউ ওঁকে ডাকতো না। গ্রামের লোকেরা ভক্তিগদগদ হয়ে ওঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতো আর মাঝে মাঝে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মাথা নাড়তো নিজেদের মনে। উকিল-মোক্তার, শাঁসালো ব্যবসায়ী, ছুটকো দোকানদার, সম্পন্ন গৃহস্থ ----- অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে 'গোয়ালাবাবা'র সান্ধ্যবৈঠকে হাজিরা দিতো এদের অনেকেই। আমার মনে কিন্তু ভারী একটা সংশয় দোলা দিতো। মনে হত বক্তা আর শ্রোতাদের মধ্যে কোথায় যেন গরমিল রয়েছে। উনি এদের যা দিতে চান এবং এরা ওঁর কাছে যা পেতে চায় তা যেন ঠিক এক বস্তু নয়। অথচ এই বিভেদটুকু অস্পষ্টই রয়ে যাচ্ছে বরাবর।

বৈঠকের পর উনি নৈশপাঠশালা পরিচালনা করেন। কাজেই বৈঠক ভাঙার পর সবাই একযোগে বেরিয়ে আসি আমরা। খানিকটা পথ একসঙ্গে চলার পর যে যার নিজের পথ ধরে।

সেদিন রাস্তায় নেমে উকীল ভৈরোপ্রসাদ বললেন, "জানেন, বাখরগঞ্জের কালুমল নাকি কুলহরিয়ায় একটা বিরাট মন্দির বানিয়ে দেবে।"

"তাই বুঝি? হঠাৎ?"

"হঠাৎ মোটেও নয়। বড় একটা কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছে পঞ্চাশ লাখ টাকার। ভাবছে গোয়ালাবাবাকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরও অনেক আমদানী হবে ভবিষ্যতে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "গোয়ালাবাবা? উনি আবার কি করলেন?"

"আরে উনিই তো পাইয়ে দিয়েছেন কন্ট্রাক্টটা। রোজ হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতো, বাবা-বাবা করতো। গোয়ালাবাবার অসাধারণ শক্তি। ওই যে আটচালার পাশে আমগাছটা দেখছেন, জন্মেও ফল ধরে না। অথচ বাবা এ গ্রামে আসার পর গত বছর ফলের ভারে গাছটা ভেঙে পড়ার জোগাড় ----।"

অন্য একজন খেঁই ধরলো, "সেবার শোনপুর থেকে সাদা গোরু কিনে আনলাম লোভ করে। কিছুতেই পাল খায় না, এদিকে আশেপাশের

গাঁয়ে সবাই জেনে গেছে ব্যাপারটা। খুঁতো গোরুটাকে বেচে দিয়ে যে দায়মুক্ত হ'বো তারও জো নেই। শেষে বাবার কাছে মানৎ করলাম। গত মাসে বিইয়েছে গাইটা আমার। এবেলা ওবেলা ছাঁকা আটসের করে দুধ দিচ্ছে এখন।"

"মানতের কথা বাবা জানেন?"

"বাস রে ! সে কি রাগ শুনে ! বাবা আমাদের একেবারে পাগল ভোলানাথ ---- যদিও জন্ম বিষ্ণুর অংশে ----।"

"অ্যাঁ? কি করে জানলেন আপনি?"

"আরে মশাই, এ সব জানার জন্যে কি বই পড়তে হয় নাকি? একজন মহাপুরুষ, অবতার, তাকে দেখলে চিনতে পারবো না?"

"কিন্তু উনি যদি ভগবানের অংশ তবে ভগবান সম্বন্ধে ও ধরনের কথাবার্তা বলেন কেন?"

বৈদ্য চুনীলাল বলেন, "আপনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী শোনেন নি? মেয়েদের কাপড় চুরি, বিবসনা গোপিনীদের দুর্দশা দেখে হাসি মস্করা, পরের বৌকে উসকোনি - এগুলো কি খুব ভগবানসুলভ কার্যকলাপ? তবু শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান একথাটা তো আর অস্বীকার করতে পারেন না! গোয়ালাবাবাও তেমনি। উনি কি বলছেন বা করছেন সেটা আসল কথা নয়। উনি কে এবং কি সেটাই আসল কথা।"

চুপ করে রইলাম। কি লাভ তর্ক করে। কেউ যদি একটা কিছু ভেবে নিতে চায় তবে সে তা ভেবে নেবেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখার ভুল হয়তো শোধরানো যায় কিন্তু ভুল চিন্তাধারা শোধরানোর উপায় আছে কি?---- চুপচাপ শুনে যেতাম। বৈঠকে যমুনাপ্রসাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং বৈঠকান্তে অন্ধকার মেঠোপথে হাঁটতে হাঁটতে গোয়ালাবাবার মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের মুখে বাবার লীলাকীর্তন।

আজমপুরে একমাস কেটে গেল। পাটনায় ফিরে যাবো এবার। পুরো একমাস কাটাবো মনে করে আসিনি। ভেবেছিলাম দু'এক হপ্তা থেকেই চলে আসবো। শেষ অবধি গড়াতে গড়াতে মাস পুরে গেল। হয়তো কুলহরিয়ার সান্ধ্য মজলিসেরই মহিমা এটা। কিন্তু এবার পাততাড়ি গোটাতেই হ'বে আমায়। ---- মনে পড়ে সেই শেষ বৈঠকের দিনটি। শেষ

দিন বলেই একটু বেলাবেলি অপরাহ্নের দিকে গেছি যাতে তাঁর সান্নিধ্যের সময়টুকু টেনে বাড়িয়ে নিতে পারি কিছুটা। রোজকার বাঁধা সদস্যরা তখনও এসে পৌঁছোয়নি। তবে আরো অন্য অনেকে বসে আছে 'বাবা'কে ঘিরে। ---- প্রতিদিনের মত উনি বলে চলেছেন আর আমরা শুনছি। অবশ্য সবাই শুনছে কিনা এবং শুনলেও তারা কতটুকু বুঝছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তাদের ভক্তিবিহ্বল স্ফারিত চোখের দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠেছিল তা আর যাই হোক বোধোদয়ের আলো নয়।

উনি বলছিলেন, "মানুষ যে সব সময় বিশ্বের কল্যাণকাজে এগিয়ে যেতে চায় না তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ সে ভাবে আমি তো অতি ক্ষুদ্র নগন্য এক দীন হীন প্রাণী। এত বড় বিশ্বের আমি আর কোন উপকার সাধন করবো। আগেই বলেছি এ ধারণা একেবারে ভুল। অন্যের দুঃখ লাঘব করার ক্ষমতা প্রত্যেকের আছে আর তা এত বিশাল যে এক জন্ম তার কাছে অতি অল্প সময়। তুমি একবার যদি এগিয়ে যাও আর থামতে হবে না, ভাবতে হবে না এরপর আর কি করার আছে। আবার অনেকে বলবে অন্যের ভাল করে আমার কি লাভ? নিজের ভাল হলেই যথেষ্ট। আমার নিজের এবং আমার একান্ত আপনার যারা। এর বাইরে অন্য মানুষের এবং অন্য প্রাণীদের কার কি হ'চ্ছে তাতে কিছুই এসে যায় না আমার। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। সবাই যদি নিজের ভাল করতে চায় তবে তো সবারই ভাল হবে শেষ অবধি। কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে তা হয় না। যে মানুষের অন্যের জীবনে শান্তি ও আনন্দ এনে দেবার অপার ক্ষমতা সেই মানুষই আবার নিজের সম্বন্ধে কোন অবস্থাতেই জোর গলায় বলতে পারেনা আমি চিরদিন সুখে ও আনন্দে কাটাবো, আমার জীবনে কখনো দুঃখ কষ্ট আসবে না।

"এই যে ইতিহাসে কত রাজারাজড়া - শাহেনশাদের কথা পড়েছি আমরা। তেমন পুরোনো মান্ধাতার আমলের ঘটনা নয় সবগুলো, আধুনিক যুগে আমাদের জীবনকালেও অনুরূপ ঘটনার কথা আমরা জানি। দেশের একছত্র অধিপতি, প্রবল প্রতাপশালী, দেশবাসীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তাদের হাতে, ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে। আবার ভাগ্যের ফেরে সেই শাহেনশাই পালিয়ে বেড়ায় দেশে দেশান্তরে, অন্যের কৃপাভিক্ষু হয়ে। এই বুঝি তাকে শত্রুর

হাতে তুলে দেয় কেউ, সঁপে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে। অথচ কত শত সহস্র লোকের দুঃখকষ্ট নিমেষে ঘুচিয়ে দেবার চাবিকাঠি হাতে ছিল তার। সেই ক্ষমতার সদুপোযোগ করলে অতগুলো মানুষকে সুখী করতে পারতো। তার বদলে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা, সুখ, শান্তি নিষ্কণ্টক রাখার প্রচেষ্টা করে গেছে কেবল। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হ'ল কই? তবেই দ্যাখো, একজন সর্বশক্তিমান লোকের পক্ষেও আপ্রাণ চেষ্টা করে এমন কোনও অমোঘ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় যাতে সে আজীবন দুঃখকষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে। লখিন্দরের লোহার বাসরেও সাপ ঢুকেছিল, দিয়েছিল মরণ কামড়।

"তবে কি কোনও উপায় নেই? এর উত্তরে বলবো যে 'আমি' নামে বিশেষ ব্যক্তি যে বিশেষ দুঃখ ভোগ করছি বা করবো তা দূর করার গ্যারাণ্টি দেওয়া সম্ভব না হ'লেও দুঃখ দূর করা বা কমানো নিশ্চয়ই সম্ভব। একবার নিজের চারিদিকে চেয়ে দ্যাখো। দেখতে পাবে যে তুমিই একমাত্র 'আমি' নেই এখানে। তোমারই মত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি 'আমি' ভিড় করে রয়েছে তোমার চতুর্দিকে। আরও দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটি 'আমি'র জীবনেই কিছু না কিছু দুঃখ আছে বেদনা আছে এবং সে দুঃখ ও বেদনাগুলোর জাত এক। আর সেই দুঃখ ভোগকারী 'আমি'রা প্রত্যেকেই নিজের ক্ষেত্রে অক্ষম হলেও অন্যের ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে যদি বলে আমি নিজেকে আলাদা করে দেখবো না, নিজেকে 'আমি-সমষ্টি'তে মিলিয়ে দেবো। নিজের দুঃখকষ্টকেও পৃথক করে না রেখে জগতের সামগ্রিক দুঃখকষ্টের মধ্যে মিলিয়ে দেবো এবং তারপর সেই সমবেত দুঃখকষ্ট লাঘব করার কাজে অর্পণ করবো নিজেকে। এই বলে সেই সমবেত 'আমি'রা যদি একযোগে জগতের কল্যাণের কাজে এগিয়ে যায় সারা বিশ্বের দুঃখকষ্ট উপশম হবে। কারণ তখন আর 'নিজের বোঝা বইতে পারছি না' বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না কেউ। নিজের বোঝা তোলার শক্তি যার নেই সে নিজের স্বল্প শক্তিটুকু অন্য কারও অপেক্ষাকৃত হালকা বোঝা তোলার কাজে লাগাবে। তার জীবনও সার্থক হবে বিশ্বের সামগ্রিক দুঃখভাগের কিছুটা লাঘব করতে পেরে। আমার কথা কি তোমরা বুঝতে পারছো?"

উনি উত্তেজিত ভাবে চারিদিকে তাকালেন। তারপর উঠে সামনে এগিয়ে গেলেন। দাওয়ার উপর একটা চাদরে রাশিকৃত সরষে

শুকোচ্ছিল। উনি চাদরে টান দিয়ে অনেকখানি সরষে মাটিতে ফেলে দিলেন। আমরা অবাক হয়ে ওঁর কার্যকলাপ দেখছিলাম।

উনি উজ্জ্বল চোখে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই যে সরষেগুলো মাটিতে পড়ে আছে, মনে করো এক একটি সরষে এক একটি প্রাণীর স্বার্থ, তার সুখদুঃখ হাসিকান্নার জগৎ। তোমাদের নিজস্ব জগতও মিশে রয়েছে এই সরষের স্তূপে, এক একটা সরষের আকৃতিতে। মনে করো আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে, ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি আসবে এখুনি। দু'এক ফোঁটা জল পড়তে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। যেটুকু সরষে উঠিয়ে ঘরে তুলতে পারবে সেটুকু রক্ষা পাবে। বাকি সব জলে ভেসে পচে নষ্ট হয়ে যাবে। সময় নেই, ওই দ্যাখো এসেই গেলো বৃষ্টি। তুমি কি এখন তোমার সরষের দানাটা খুঁজে মরবে, না হাতের কাছে যা পাও যতগুলো পাও একধার থেকে তুলতে থাকবে যতক্ষণ পারো। এর মধ্যে হয়তো তোমার সরষেটা থাকবে, কিংবা থাকবে না। হয়তো অন্য কারও তোলা সরষের সঙ্গে থাকবে সেটা কিংবা হয়তো বা তোমার সরষেটা জলে পচে নষ্ট হবে। কিন্তু সে সব ভেবে সময় নষ্ট করা চলবে না কারণ নষ্ট করার মত সময় যে নেই ! তোমার সরষেটিকে যেমন ইচ্ছে করে ফেলে আসবে না তেমনি সেই এক দানা সরষের খোঁজে হাত গুটিয়ে বসেও থাকবে না। তার কারণ একটা দানার থেকে পাঁচ কিলো সরষে বেশী মূল্যবান বলেই শুধু নয়, তার কারণ হাজার চেষ্টা করেও একটা বিশেষ সরষে দানার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারো না তুমি ----।"

আবার গ্রামের সেই মেঠো পথ। খানিক আগের মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ শ্রোতারা এখন সবাক সোচ্চার। আজ আর ওদের আলোচনায় যোগ দিতে এতটুকু আগ্রহ ছিল না আমার। কিছুদূর যাবার পর সবাই যার যার আলাদা পথ ধরলো। শিউপুজনবাবুর গন্তব্যস্থল আজমপুর পেরিয়ে। উনি আমাদের সঙ্গে চললেন একথা সেকথা বলতে বলতে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে গোয়ালাবাবার আজকের কথাগুলো চিন্তা করছিলাম, যা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। সত্যিই তো নিজের চারদিকে গণ্ডী টেনে, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতে আপন শক্তি ও সময়ের ব্যর্থ অপচয় না করে সেই শক্তি ও সময় যদি প্রত্যেকে বিশ্বের কল্যাণকাজে নিয়োগ করে তবে সারা বিশ্বের চেহারা পাল্‌টে যাবে। বিরাট কিছু করার ক্ষমতা হয়তো সবার নেই, কিন্তু কত অনায়াসে অন্যের জীবনে আশা ও আলোর পরশ এনে দেওয়া যায় তা ভাবলে

অবাক হয়ে যেতে হয়।

আমাদের আগে আগে এক বৃদ্ধা একটি ছেলের হাত ধরে যাচ্ছিল। শীর্ণ মলিন চেহারা দু'জনেরই। আমাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবো আমরা। ক্লান্ত দেহখানা অতিকষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে। হয়তো সারাদিন অভুক্ত আছে, সামান্য যা অন্ন জোটাতে পেরেছিল ছেলেটির মুখে তুলে দিয়েছে। ছেলেটি হয়তো বুড়ির বাপ-মা মরা নাতি, তার শেষজীবনের সম্বল। ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক মুহূর্ত থামলাম। একটা টাকা পকেট থেকে বার করে বুড়ির হাতে গুঁজে দিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেলাম। বুড়ি অস্ফুটস্বরে কি যেন বলতে গেল। আমি তা শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম না। শিউপুজনবাবু পানছোপানো ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

সদাশিব বললো, "বিরিঞ্চি কালই পাটনায় ফিরে যাচ্ছে।"

কথাটা ও কেন বললো, আমার আজকের আচরণের কারণ হিসেবে না শিউপুজনবাবুর কাছে আমার হয়ে বিদায় সম্ভাষণ হিসেবে, জানিনা। শিউপুজনবাবু হাসি থামিয়ে মাথা নাড়লেন।

তারপর পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে বললেন, "আর তাহ'লে আপনার সঙ্গে দেখা হ'বে না। আপনাকে একটা জিনিস দিচ্ছি। যত্ন করে রাখবেন।" পকেট থেকে হাত বার করে আমার হাতে দিলেন কয়েক দানা সরষে।

আমি বিস্মিত হয়ে কোনও প্রশ্ন করার আগেই ঘাড় হেলিয়ে আত্মতৃপ্তির সুরে বললেন, "বাবা দেখলে আর রক্ষে রাখতেন না। তবে আমি একা নই, অন্যরাও যে যা পেরেছে নিয়েছে।"

সদাশিবকেও কয়েক দানা দিলেন।

বললেন, "এ সরষের দানা কাছ-ছাড়া করবেন না। বিপদে আপদে রক্ষা করবে। সর্ব কর্মে ইষ্টসিদ্ধি হ'বে।"

(২)

পরদিনই পাটনা রওনা হলাম। এর কিছুকাল পর একটা ভাল চাকরি জুটে গেল কলকাতায়। কয়েকটা বছর কেটে গেল। বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হয়েছি ইতিমধ্যে। সংসারের কুম্ভীপাকে পড়ে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর নেবার পাট উঠে গেছে ----।

আমার ছোটশালার বিয়ে উপলক্ষে আবার বিহারে যাবার সুযোগ পেলাম। বহু বছরের ব্যবধানে। শশুরমশাই গত হয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি হিসেবে আমার দায়দায়িত্ব অনেক। বরকর্তা হয়ে দলবল নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কন্যার নিবাসস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। রাস্তার মাঝামাঝি এসে ট্রেন থেমে গেল। শুনলাম বন্যায় লাইন টাইন সব ডুবে-ভেসে গেছে, আর এগোনো অসম্ভব। খবর শুনে মাথায় বজ্রপাত হ'ল যেন। কাল বাদে পরশু বিয়ে। এখন বরসুদ্ধু এই বেনোজলে আটক পড়লে যে সব রসাতলে যাবে !

কাগজে বিহারের বন্যার বিষয় পড়লেও ঠিক এতটা আশঙ্কা করিনি। ট্রেন রদ হবার বিপত্তিটা আনকোরা নতুন, জলের লেভেল নাকি চড়চড় করে উঠে গেছে গত অর্ধ দিনে। কর্মফল আর বলে কাকে ! কন্যার পিতার প্রতি সৌজন্যবোধেই আরও আগে গিয়ে পৌঁছতে চাইনি আমরা। বরযাত্রি বেশী না হলেও অনেক কেটেছেঁটে নিকটবন্ধু আত্মীয় মিলিয়ে জনকুড়ি। মাগ্গিগণ্ডার বাজারে এতগুলো লোকের তত্ত্বতোয়াজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ পরোপকার করতে গিয়ে বিপদ বাধালাম আমরাই। সময়মত শ্যালকবাবাজীকে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত করতে না পারলে আচ্ছা উপকৃত হবেন ভদ্রলোক !

শুনেছি ডুবন্ত মানুষ নাকি বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। আমিও সেই নিঃসীম অন্ধকার পারাবারে মস্তক তোলপাড় করে এক অতি ক্ষীণ আলোকরেখা গোচরীভূত করলাম। আমাদের ট্রেন যে জায়গাটায় এসে আচমকা রুকে গেল আজমপুর সেখান থেকে বেশী দূর নয়। একথা সত্যি যে গত দশ বছরের মধ্যে সদাশিবের কোনও খোঁজখবর নিইনি। ও যে ইতিমধ্যে আজমপুরের বাস তুলে দেয়নি

তারও কোন স্থিরতা নেই। তবু নিশ্চল ট্রেনের কামরায় বসে আঙুল না কামড়িয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

ট্রেনের কিছু কিছু লোক হাঁটাপথে চলতে শুরু করেছে। আমরাও তাদের অনুসরণ করলাম।.....মাইল আষ্টেক পথ। শহরের গাড়ি ঘোড়ার ভিড় যেমন নেই তেমনি শহরের মত টানা ঝরঝরে রাস্তা নয়। অসমান, এবড়োখেবড়ো, চোরা গর্তে ভরা। সাবধানে হোঁচট সামলে হাঁটতে হয়, চলার গতি সীমিত রেখে। আসে পাশের বন্যাবিধ্বস্থ এলাকা থেকে বহু শরণার্থী এসব দিকে চলে এসেছে। এদিকটায় বন্যার জল পৌঁছয়নি তবে অবিরাম প্রবল বৃষ্টিতে মাটির চালাঘর নষ্ট হয়ে এ অঞ্চলেও গৃহহারা আশ্রয়হারা হয়েছে অনেকে। বাইরে থেকে আসা নিঃস্ব শরণার্থীর দল আর দুস্থ স্থানীয় লোকগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে পথের দুধারে। বড়ই করুণ সেই পরিব্যাপ্ত হতাশার ছবি।

আজমপুরে যখন পৌঁছলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সদাশিব আমাকে সদলবলে দেখে বিস্মিত হ'ল। সব কথা খুলে বললাম। সদাশিব খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলো।

তারপর বললো, "দেখি কি করতে পারি।"

আমাদের জন্য রাশিকৃত খাবার এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। হাত ধুয়ে চটপট খেতে বসে পড়লাম সবাই। সদাশিব আমার পাশে বসে কুশলপ্রশ্নাদি করতে লাগলো। কলেজে থাকতেই ওর বিয়ে হয়ে গেছিল। ছেলেপুলেদের দেখলাম। ওর স্ত্রী ঘোর পর্দানশীন। নেপথ্য থেকেই আদরসৎকার করতে থাকলেন অতিথিদের। খাওয়া শেষ হতেই সদাশিব আমাকে বাইরে নিয়ে এলো। বৈঠকখানায় ঢালা বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে বরযাত্রিদলের বিশ্রামের জন্যে। যানবাহনের ব্যবস্থা হলেই রওনা দিতে হ'বে। ততক্ষণ একটু হাতপা ছড়িয়ে গায়ের ব্যথা মারুক।

বাইরে এসে দেখি একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব কোঁচা সামলে সন্তর্পণে উঠে বসে পাশের জায়গাটায় চাপড় মেরে বললো, "চলে আয় বিরিঞ্চি।"

তারপর রিক্সাচালককে নির্দেশ দিলো, "গোয়ালাবাবাকা আশ্রম। জরা

সম্ভল্‌কে চলনা ভাইয়া।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "গোয়ালাবাবা এখনও আছেন ওখানে?"

"নারে, বহুদিন আগে চলে গেছেন। তা প্রায় বছর দশেক হ'বে। আশ্রম বানাবার তোড়জোড় আরম্ভ হতেই বাবা হঠাৎ একদিন কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন ! বাখরগঞ্জের কালুমল পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করবে কথা ছিল, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার নয় পুরো লাখ টাকা ঢাললো কালুমল। এলাকার আরও অনেকে টাকা দিয়েছে। আশ্রমটা এখন এ তল্লাটের একটা নাম করা প্রতিষ্ঠান। গেলেই দেখতে পাবি।"

বল্লাম, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখন ওই আশ্রম দেখতে না গিয়ে বরং একটা যানবাহনের জোগাড় কর না ভাই। আর বিশ ঘণ্টাও বাকি নেই বিয়ের লগ্ন লাগতে। আমার তো ভয়ে হাতপা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।"

সদাশিব বললো, "সেই জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোকে। বাবার মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে একটা মানৎ করবি।"

আমাকে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সদাশিব সলজ্‌জ হেসে বললো, "জানি তুই এসব মানিস না। আমিও আগে পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু একেবারে হাতে হাতে ফল পেয়েছি যে ! বাবার থানে মানৎ একেবারে অব্যর্থ ! আমার ছোটভাই কানহাইয়াকে দেখেছিস্ তো? পাটনায় এম.এ. পড়ছিল হস্টেলে থেকে। হঠাৎ খবর পেলাম ও নাকি এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়েছে এবং তাকেই বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর। আমরা মত না দিলে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতেও রাজি কিন্তু ওই মেয়েকে বিয়ে না করে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

"বারতা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। আমাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন প্রেম করে বিয়ে করেনি। তার উপর মেয়েটা নাকি জাতে আহির। আমাদের ভুমিহার বামুনের বাড়িতে বউ হয়ে ঢুকবে এক আহিরের মেয়ে ! মা তো মাথা ঠুকে ঠুকে কপালে ডাব গজিয়ে ফেললো। উনুনে আগুন পড়লো না তিনদিন। বাড়ির সব ক'টি প্রাণী হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে সমানে। এমন সময় গোয়ালাবাবার কথা মনে পড়লো। বাবা নাকি কাউকে খালি হাতে ফেরান না। যে কেউ বাবার শরণ নেবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বেই। ভাবলাম দেখাই যাক্ না কি হয়।

কুলহরিয়ায় মন্দিরে গিয়ে কেঁদে পড়লাম ----- দোহাই বাবা, আমাদের বংশের মুখে চূণকালি লাগতে দিওনা তুমি। কানহাইয়াকে সুমতি দাও বাবা। ছুঁড়িটার খপ্পর থেকে আমার ভাইকে বাঁচাও ----। তুই বিশ্বাস করবি না বিরিঞ্চি দশদিনের মধ্যে মতি ফিরে গেল কানহাইয়ার। আর মাস না পুরতেই সুড়সুড় করে আমাদের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে এলো কোনরকম গাঁইগুঁই না করে।"

অবাক হয়ে শুধোলাম, "কিন্তু কি করে ঘটলো ব্যাপারখানা? সেই সহপাঠিনীকে বিয়ে করলো না কেন?"

সদাশিব হেসে বললো, "আরে সে ভারী মজার ব্যাপার। আমি যেই না বাবার কাছে মানৎ করলাম ব্যস সেই দিনই মেয়েটার সারা মুখ ব্রণমেচেতায় ভরে গেল। বিচ্ছিরি সব দাগ সারা শরীরে। অমন ডাকসাইটে সুন্দরী একেবারে যেন শ্যাওড়াতলার পেত্নী হয়ে গেল। আর তাই না দেখে আমার 'বর্খুর্দার্' ভাই প্রেমট্রেম ভুলে সোজা আজমপুর অভিমুখে ছুট দিলো।"

বললাম, "আহা, মেয়েটার দাগগুলো আর সারলো না তারপর?"

"সারলো, তবে অনেক পরে। কানহাইয়ার বউ এলো, বছর ঘুরে সেই বউয়ের বাচ্চা হ'ল, তবে গিয়ে নিষ্কৃতি পেলো ছুঁড়িটা। বাবার সবদিকে আটঘাট বাঁধা। পাছে চিত্তবিভ্রমের ছিটেফোঁটাও আবার নতুন করে চাগাড় দেয় তাই পিতৃত্বের গুরু দায়িত্বভার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তবে গিয়ে রাশ ছাড়লেন।"

ওসব অঞ্চলে রাস্তাঘাট এমনিতেই এমন কিছু আহামরি নয়। তায় আবার বর্ষার প্রকোপে জায়গায় জায়গায় জমি ধ্বসে গেছে। বৃষ্টির জল জমে ছোটখাটো অনেক ডোবা-পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। রিক্সাওলাটা অতি সন্তর্পণে রিক্সা টানছিল। বার কয়েক রিক্সা থেকে নেমে আমাদেরই ধরাধরি করে রিক্সাটাকে ডোবা-খন্দ পার করে আবার রাস্তায় তুলতে হ'ল।

"এ সময়টা সাপখোপের খুব ভয়। অন্ধকারে হাঁটাচলা নিরাপদ নয়, বুঝলি বিরিঞ্চি ! তা নাহ'লে হেঁটেই মেরে দেওয়া যেত এটুকু রাস্তা।"

খানিক দূরে দূরে মেয়ে-পুরুষ-শিশুদের জটলা। বিকেল বেলা বোধহয় এদেরই দেখেছিলাম পথের দু'ধারে। এখন রাতের বিশ্রামের জোগাড় করছে। কেউ গাছতলায় - কেউ বা খোলা আকাশের নীচে। রাস্তায় মাঝে মধ্যে একআধটা বাতী জ্বলছে, আর আকাশে একাদশীর টিমটিমে চাঁদ। আলো বলতে এদের এখন এটুকুই সম্বল। কুলহরিয়ায় ঢুকে পড়েছি আমরা। বড় আমবাগানটার পাশ দিয়ে রিক্সা যাচ্ছে। সেবার গরমকালে সদাশিব প্রাণভরে আম খাইয়েছিল আমায়। ঝাঁকাভর্তি আম গাছ থেকে পাড়িয়ে সোজা বাড়িতে নিয়ে তুলতো। ঝাঁকা পিছু দাম বাঁধা আছে। বাজারে এই আমই দু'নো দামে বিকোয়। বাগান থেকে সদ্য পেড়ে আনা ফলের সেই তর্‌তাজা সুস্বাদ সুগন্ধটুকু থাকে না তাতে।

"ব্যস, পৌঁছে গেছি।"

আমবাগানটা পার হয়ে বাঁক ঘুরতেই আলোয় ঝলমল অট্টালিকা ভোজবাজির মত দৃষ্টিপথে উদয় হল। এই ধাপধারা গোবিন্দপুরে এমন জেল্লাদার হালফ্যাসানের ইমারৎ কল্পনাও করতে পারিনি। রিক্সা থেকে নেমে গেটের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। লাল সুরকি বিছানো পথের দু'ধারে দিশী বিলিতী নানারঙের ফুলের বাহার। অট্টালিকার একপাশে মন্দির, বাকি অংশটা আশ্রম। ঝকঝকে টাইল দেওয়া প্রশস্ত বারান্দা। শ্বেতপাথরের স্তম্ভে সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভা পাচ্ছে। মন্দিরের পাশে শানবাঁধানো চত্বর। সারা প্রাঙ্গন আলোয় আলোময়। ভারী শান্ত সুন্দর পরিবেশ, মনটা প্রশান্তিতে ভরে ওঠে।

প্রশ্ন করলাম, "আশ্রমে কারা থাকে?"

সদাশিব বললো, "এখন শুধু পুরোহিত ও বাবার সেবাইৎ ক'জন আছে। আটখানা ঘর আছে, একটা বড় হলঘর। লাগোয়া বাথরুম। চৈত্রমাসে বাবার পূণ্যতিথিতে হোম হয়। তিনদিন ধরে পাঠকীর্তন চলে। দারুণ রৌনক্‌-রোশনাই থাকে সে ক'দিন। বাইরে থেকে যে সব ভক্তরা আসে তারা আশ্রমেই এসে ওঠে, আগে থেকে ঘর বুক্‌ করে রাখে।"

হঠাৎ খট্‌কা লাগলো, "তবে যে বললি উনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন? পূণ্যতিথি মানে তো মৃত্যুবার্ষিকী!"

"বাবা অনেককে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। বলেছেন ওঁর মর্ত্যের কাজ শেষ হয়ে গেছে তাই যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গেছেন

আবার,” সদাশিব আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালো।

তারপর আমার আসন্ন মন্তব্য আন্দাজ করেই বোধহয় বেশ জোরালো গলায় তর্‌তর্‌ করে বলে গেল, “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। বিরিঞ্চি, আমরা হলাম সেই যে বলে, আদার ব্যাপারী। আমাদের ওসব জাহাজী-কারবার নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। এখন বাবার কৃপায় তোর এই বিপদটা কেটে যাক, সেইটাই বড় কথা। নয়কি?”

দাউ টু ----- রুটাস ! অবশ্য আমার তখন আর সদাশিবের এই রূপান্তরণে আশ্চর্য প্রকট করার মত মনের অবস্থা নেই। সদাশিব বিপদের কথাটা উল্লেখ করামাত্র সমস্যার গুরুত্বটা আবার সম্যকভাবে চেতনার উপর চেপে বসলো। প্রচণ্ড হতাশায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

সদাশিব নরম গলায় আশ্বাস দিলো, “ভাবিস্‌নে বিরিঞ্চি। ভক্তিভরে বাবাকে ডাক। বাবা নিশ্চয়ই একটা উপায় করে দেবেন।”

জুতো খুলে খালি পায়ে মন্দিরে ঢুকলাম। মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়াবস্ত্র ধারী একজন প্রৌঢ় বিড় বিড় করে মন্ত্র বলছে আর তার সামনে অনুরূপ বেশবাস তিনটি তরুণ এক থালা সরষের উপর হাত রেখে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে। সদাশিব আমার কাঁধে হালকা চাপ দিয়ে আমাকে সামনের পানে ঠেলে দিলো। আমি ওর ইঙ্গিতানুসারে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

তারপর হাত জোড় করে আকুল প্রার্থনা জানালাম, “হে গোয়ালাবাবা, আমরা যেন বেলাবেলি সুজানপুরে গিয়ে পৌঁছতে পারি। যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি সেটা যেন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। দেখো বাবা আমার যেন মুখ থাকে। শেষরক্ষা কোরো বাবা!”

প্রার্থনা মনে মনেই করেছিলাম। তবু মনে হ’ল যেন আমার মনের আকুতি তরঙ্গিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। প্রৌঢ় গেরুয়াধারী চোখ মেলে চাইলেন। অন্য তিনজন তরুণ তাপসও চোখ খুললো। তাদের মধ্যে একজন নিঃশব্দে উঠে কোথা থেকে ছোট ছোট দু’টো কাপড়ের থলি নিয়ে এলো। প্রৌঢ় লোকটি একমুঠো করে মন্ত্রপূত সরষে ভরলেন

তাতে, তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন থলিদু'টো। থলি নিয়ে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম, দরজার পাশে রাখা দানপাত্রে দক্ষিণা রেখে। এবার রিক্সায় চড়ে ফিরতি পথে অভিযান ----।

ফিরে গিয়ে দেখি ভারী তোড়জোড় পড়ে গেছে সদাশিবের বাড়িতে। আমার ছোটশ্যালক সলজ্জ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ফটকের সামনে। দলের অন্য ছোকরারা শোরগোল করছে। আমাদের দেখেই "এসে গেছে, এসে গেছে," রোল তুললো সবাই। অনতিদূরে দু'টো স্টেশন-ওয়াগন দাঁড়িয়ে। ওয়াগনের গায়ে একটা মুরগির ছবি। একরাশ ডিমের কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সগর্বে কি জানি বলছে মুরগিটা।

সদাশিবের ভাই কানহাইয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। এবং কাছে এসে বিবরণ শোনালো: পশ্চিম পাকিস্তানের এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোক আজমপুরে একটা পোলট্রি খুলেছিলেন কয়েক বছর আগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুর্লভ ব্যবসাবুদ্ধির বলে এই ক'বছরেই সেটাকে এক বিরাট লাভদায়ক কারবারে দাঁড় করাতে সমর্থ হন। এখান থেকে দূরদূরান্তে ডিম চালান যায়। অনেক নামকরা হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, হস্টেল, মেসবাড়ি বাঁধা খদ্দের তাঁর। বন্যার দরুন রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে হাজার হাজার ডিম পচে নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ভদ্রলোক হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ান ডিম চালান দেবার অন্য কোনও উপায়ের খোঁজে এবং শেষ অবধি উপায় বারও করেন। ঘুরপথ দিয়ে নিয়মিত ডিমের চালান বজায় রেখেছেন সকল দৈবদুর্বিপাক তুচ্ছ করে। সুজানপুর তাঁর এলাকার মধ্যেই পড়ে, সেখানেও বহু খদ্দের আছে তাঁর। কানহাইয়ার মুখে আমাদের বিড়ম্বনার কথা শুনে সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। আমরা যদি এখুনি যাত্রা করি কাল দুপুর নাগাদ সুজানপুরে পৌঁছে যেতে পারি। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম আমরা, কন্যাপক্ষকে একটা টেলিগ্রাম ঠুকে দিয়ে।

খুব একটা আরামদায়ক যাত্রা না হ'লেও লগ্ন থাকতে থাকতে পৌঁছতে পেরেছিলাম। কন্যার পিতা আধুনিক সংস্কারমুক্ত মানুষ। টেলিগ্রামখানা হাতে করে ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আমরা কোলকাতায় ফিরে এলাম, চিরাচরিত রুটিন জীবনে। তবে এই ঘটনার পর আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুমহলে

দারুণ খাতির বেড়ে গেল আমার। বাড়িতেও।